Green University of Bangladesh

Department of Computer Science and Engineering

Midterm Exam Assignment

Course Title: Functional Bengali

Course code: GED 201

Date of Submission: 20.11.2020

Submitted to:	Submitted by :
Name : Mohammad Inzamam	Name : Jakirul Islam
Designation : Lecturer	ID : 193002101
Green university of Bangladesh	Department : CSE
	Green university of bangladesh

<u>১ নং প্রশ্নের উত্তরঃ</u>

বাংলা সাহিত্যঃ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছর বা তার কিছু অধিক সময়ের ইতিহাস। সাহিত্যকর্মের বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে নির্দিষ্ট যুগের চিহ্ন ও সাহিত্যের বিবর্তনের ধারাটি বিশ্লেষণ করেই সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগ করা হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কে প্রধানতঃ তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে।

১. প্রাচীন যুগ ২. মধ্যযুগ ৩. আধুনিক যুগ ।

প্রাচীন যুগঃ

৯৫০-১২৫০ সালের মধ্যে চর্যাপদ রচনা করা হয়। অন্যান্যদের মতে ৬৫০ অব্দে এর রচনা শুরু। বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন হল চর্যাপদ। সমকালীন বাংলার সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্র এই পদগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। চর্যাপদের পুঁথিটি যে রুপে পওয়া গেছে তাতে বোঝা যায় , এটি বিভিন্ন সময়ে আর্বির্ভূত বিভিন্ন কবির রচিত কবিতা-সমষ্টির সংকলন। চর্যাপদের আবিষ্কারের মাধ্যমে বাংলা ভাষার আদি স্তরের লক্ষণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। সেই সঙ্গে পালযুগের সাধারণ বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় এতে রুপলাভ করেছে। ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ দরবার থেকে তিনটি বই নিয়ে আসেন ১৯১৬ সালে শাস্ত্রী হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা গ্রন্থের ২৪ জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের রচিত চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের ৪৭ টি গান চর্যাপদ নামে পরিচিত। মুনিদত্ত চর্যাপদের টীকাকার ছিলেন। ধর্মনির্ভর, আধ্যাত্মিক ও আত্নগত বিভেদ অপেক্ষা করে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো রুপ নিয়েছিল।

মধ্যযুগঃ

মধ্যযুগ ১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্প্রসারিত। ধ্যযুগের প্রথম নির্দশন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। এটি চৌদ্দ শতকের দ্বিতায়ার্ধে রচিত। এছাড়াও অন্যান্য সাহিত্য কর্মের মধ্যে আছে বেষ্ণব পদাবলি, মঙ্গল কাব্য, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ইত্যাদি।

মধ্যযুগের বিশাল পরিসর জুড়ে ছিলো মঙ্গলকাব্য। দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক এই কাব্যধারার সূত্রপাত হয় পনের শতকে। পনের শতকের শেষার্ধে কবি কৃত্তিবাস কতৃক সংস্কৃত রামায়নের বঙ্গানুদের মাধ্যমে এ ধারার সুত্রপাত এবং মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদের মাধ্যমে তা সম্প্রসারিত হয়। ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি এ পর্যায়েরই নানা শাখা। এই ধারার অন্যতম কবি মাণিক দত্ত, কানাহরি দত্ত, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর প্রমুখ। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ সমৃদ্ধির পথে অনেকখানি এগিয়ে যায়। মধ্যযুগেই আরাকানের রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয়। এছাড়া শাক্ত পদাবলী, নাথসাহিত্য, বাউল ও অপরাপর লোকসঙ্গীত, ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা ইত্যাদি অমূল্য সাহিত্য মধ্যযুগেরই সৃষ্টি।মধ্যযুগের শেষের

দিকে কবিওয়ালাদের আর্বিভাব সমকালীন স্থুল রুচির পরিতৃপ্তি ঘটায়। এমনি ভাবে ১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বৈচিত্রপূর্ণ সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হয়েছিল।

আধুনিক যুগঃ

১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ । কালের দিক থেকে আধুনিক যুগকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা যায়- ১৭৬০-১৭৯৯খ্রিঃ আধুনিক যুগের প্রথম পর্ব । ১৮০০-১৮৫৮খ্রিঃ আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্ব । আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ্যযোগ্য ভাবে বিকশিত হয়েছে। এই যুগে নাটক, প্রবন্ধ উল্লেখ্য ভাবে প্রচলন ঘটেছে। এই যুগে রবিন্দ্রনাথের আগমন হয় এবং বাংলা সাহিত্যের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে ।

<u>২ নং প্রশ্নের উত্তরঃ</u>

চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম পদ সংকলন তথা সাহিত্য নিদর্শন। এটি রচিত হয় প্রাচীন যুগে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সর্বপ্রথম চর্যা পদ আবিষ্কার করেন। চর্যাপদ রচনা করেন ২৪ জন বৌদ্ধসাধক যারা সমাজ বহির্ভূত ছিলেন। চর্যাপদের মধ্যে সে যুগের কিছু

সমাজ চিত্র ফুটে উঠেছে। এতে মানুষের জীবন যাত্রা ও আচরণের প্রতিরুপ থকায় গানগুলো মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

চর্যাপদের যে সমাজ চিত্র পাওয়া যায় তা সমগ্র ভারতের। চর্যাপদের কবিরা বৌদ্ধসাধক যারা সমাজ বহির্ভূত ছিলেন।তাই চর্যাপদ বাংলা- আসাম সমাজের চিত্র দান করেন না । এটা বর্হিগ্রাম বাসী নিচু শ্রেণির যারা সাধারণত নিরক্ষর , নিঃজ্ব মানুষের চিত্র দান করেন। বাংলা সাধন সংগীত শাখাটির সূত্রপাতও হয়েছিলো এই চর্যাপদ থেকেই। সে বিবেচনায় এটি একটি ধর্মগ্রন্থজাতীয় রচনা। একই সঙ্গে সমকালীন বাংলার সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্রাবলি এই পদগুলোতে উজ্জ্বল।

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী

হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী

বেঙ্গ সংসার বডহিল জাঅ

দুহিল দুধ কি বেন্টে ষামায় ।

"যার অর্থ হলো টিলার ওপরে আমার ঘর, আমার কোনো প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে আমার ভাত নেই, আমি প্রতিদিন উপোস থাকি। বেঙের মতো প্রতিদিন আমার সংসার বেড়ে চলেছে, যে-দুধ দোহানো হয়েছে তা কি আবার ফিরে গাভীর বাঁটে। এই পদে পারিবারিক জীবনের আচার ও ব্যভিচার উভয়ই সমান দক্ষতায় ফুটে উঠেছে।

এক সে শুন্ডিনী ঘরে সান্ধই

চীঅন বাকলত বারুনী বান্ধই।

এক সে শুডিনী ঘরে ধোকে । চিকন বাকল দিয়ে সে মদ চোলাই করে। এছাড়াও চর্যাপদের বিভিন্ন পদে কাঠুরে, ধুনরী, নটী এর কথা উল্লেখ্য আছে।

চর্যায় বাঙালি সমাজের, বিশেষত ব্রাহ্মণ্যপীড়িত অন্ত্যজ সমাজের এক দরদী চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ডোম, শবর, চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকার নানা তথ্য এই পদগুলি থেকে জানা যায়।

সমাজে বর্ণাশ্রম সমাজ বহির্ভূত অসৎশুদ্র ও জল অনাচরণীয় শ্রেণির কথাই বেশি স্থান পেয়েছে। এছাড়া দরিদ্র জীবনের চিত্র ও আছে।

চর্যার কবিতায় নীচও অন্ত্যজ শ্রেণির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কোথাও দরিদ্র জীবনের বেদনা বিষাদের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাঁধা কেন্দ্রীয় নারী তথা নায়িকা চরিত্রে ঘোষ পরিবারে জন্ম। অপূর্ব সুন্দরী রাধার বিয়ে হয় বীরপুরুষ আয়ান ঘোষ এর সাথে। আয়ান ঘোষের গৃহে রাধার দেখাশুনার দায়িত্বভার পরে তার পিসিমা বড়াই এর উপর। পৌরাণিক কাহিনী মতে রাধা মানবাত্মার প্রতীক। এ কাব্যে রাধা রক্তমাংসে গড়া এক নারী যার মনে প্রেম আছে আবার দৈহিক কামনা বাসনা চরিতার্থ করার আকাঙক্ষাও আছে। অপরপক্ষে পদাবলীর রাধা বৃকভানু বা বৃষভানু রাজার কন্যা। কলাবতী বা কীর্তিদা তাঁর জননী। চন্দ্রাবলী তাঁর সখী ও প্রতিনায়িকা। এখানে রাধা ও কৃষ্ণের সখী ও সখাদের উল্লেখ আছে।পদাবলী সাহিত্যে যে রাধা চরিত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেই অর্থে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রাধা তার থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। পদাবলীর রাধা ভাব-বৃন্দাবনের অধিবাসিনী। প্রথম থেকেই সেই জন্যই যোগিনী সেজে কৃষ্ণের উপাসনা শুরু করেছেন। তাঁর মধ্যে প্রেমের প্রথম বিস্ময় চাঞ্চল্য নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা প্রকৃতপক্ষে মানবী।

কৃষ্ণের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে রাধা এবং বড়াই কে সরষে বলেন;-" নান্দের ঘরের গরু রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা"। বংশী খণ্ডে রাধা উত্তীর্ণ যৌবনা নারীতে পরিণত হয়েছে। কৃষ্ণের বংশী ধ্বনি শুনে রাধার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বড়াইয়ের উপদেশে রাধা কৃষ্ণের বাসি চুরি করে নিলেন। কিন্তু পরে সে অবশ্য বাঁশি কৃষ্ণকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল রাধাকে।

বিরহকাতরা রাধিকার নতুন রূপ আমরা দেখতে পাই। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় তাম্বুল খণ্ড থেকে বাণ খণ্ড পর্যন কৃষ্ণের্ত যে রূপের পরিচয় পেয়েছি সেখানে আর যাইহোক না কেন শোভনতা বা শালীনতা একান্ত অভাব আছে। পদাবলী সাহিত্যে আমরা যে রাধিকাকে পায় কৃষ্ণই তো তার সুখ সর্বস্বা, কৃষ্ণ অন্তপ্রাণ। রাধা প্রথম থেকেই তিল তুলসী দিয়ে কৃষ্ণের দেহ সমর্পণ করছেন

কিন্তু অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা প্রথম থেকেই প্রতিবাদী কৃষ্ণের আচরণের প্রতি তৎসত্ত্বেও কৃষ্ণ তাকে প্রতিনিয়ত আহ্বান করেছে। এই আহ্বানে রাধা কোনরূপ সাড়া দেয়নি। বিশেষ করে ভার খণ্ডে বা ছত্র খণ্ডে, রাধার মনের পরিবর্তন লক্ষ্য করার মতো। এখানেই একজন মানবী নারীকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। যিনি প্রথম জীবনে বহু দুঃখ লাঞ্ছনা সহ্য করে যৌবনে পৌঁছেছে তবে তিনি কৃষ্ণ প্রেমের মহিমা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। প্রাথমিকভাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংযত হলেও শেষ পর্যন্ত রাধা

কৃষ্ণের কাছে তার সর্বস্ব নিবেদন করেছে। সেই নিবেদনের মধ্যে কোথাও কোন প্রতিক্রিয়া নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা বহুবার কৃষ্ণের সঙ্গী সম্মিলিত হয়েও দেহজ বাসনা কামনা কে ভুলতে পারেনি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা যে মানবী। এটাই তার বড় প্রমাণ।